# দ্বিতীয় প্রবাস - ১০

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

২৬ শে আগষ্ট, ২০০৬, শনিবার ঠিক দুপুর বেলায় আমরা ন্যুয়ার্কের লিবার্টি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে অবতরণ করলাম। ব্যাগেজ কালেক্ট করার জন্য নির্ধারিত বেলটের দিকে আগাতেই বন্ধু মাহমুদ হাসান হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন 'ওয়েলকাম টু ন্যুয়ার্ক'। প্রায় তিনযুগ পর দেখা হলেও আমেরিকায় ছাত্রজীবনে আমার একবছরের কনিষ্ঠ অনুগামী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে (আইবিএ) কর্মজীবনের সহকর্মী মাহমুদ হাসানকে চিনতে একটুও কষ্ট হলো না। বয়স তার মাথার প্রায় সবগুলো চুলই কেড়ে নিয়েছে; কিন্তু তার যৌবনের বাংলা ছায়াছবির নায়কের মত চেহারা এবং ট্রেডমার্ক সদা সহাস্য মুখের খুব একটা পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তিনি একটুও মোটা হননি। আমার ভয় ছিল যে হাসানও হতো আমাকে চিনতে পারবেন না। ১৯৯৪ সালের ঈদুল আজহার দিন ধুমপান ছেড়ে দেবার পর থেকে বেগম সাহেবার মোটামুটি কড়া নজরদারি সত্বেও আমার মা'শাআল্লাহ যা শারীরিক স্ফীতি হয়েছে তাতে অনেক সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গা চোখে আমি নিজেই আমাকে চিনতে পারিনা। অন্যদিকে গত তিন যুগে নাসিম, মানে আমার স্ত্রী এক ছটাকও বেড়েছেন কিনা সন্দেহ। ওকে দেখলে মনে হয় দেশে খাবারের আকাল পরেছে, আর আমাকে দেখলে মনে হয় আমিই তার কারণ। সে যাই হোক, আমার আশা, হাসান আমাকে না চিনতে পারলেও নাসিমকে অবশ্যই চিনবেন। কিন্তু সব দূর্ভাবনার অবসান ঘটিয়ে আমরা দু'জনই দু'জনকে খুব ভালোভাবেই চিনলাম; কোনই কষ্ট হলো না। এবং কি আশ্চর্য, একবারও মনে হলোনা যে দু'জনের শেষবারের দেখার পর এতটা লম্বা সময় পার হয়ে গেছে। দু'জনে একত্রে ব্যাগেজ বেলটের দিকে এগিয়ে গেলাম।

হ্যান্ড লাগেজ সহ আমাদের মোট ছয়খানা ব্যাগ। আমার ধারণা ছিল ওগুলো নেওয়ার জন্য দুটো গাড়ী লাগবে। রওয়ানা হবার আগের রাতে তাই মাহমুদ হাসানকে জানিয়েছিলাম যে আমার ভাগ্নী মাহারীন ও তার স্বামী তারেক - ওরাও নিউ ব্রানসউইক থাকে - মাল পত্র নিয়ে সাহায্য করার জন্য এয়ারপোর্টে আসতে পারে। উত্তরে উনি জানিয়েছিলেন যে তার দরকার হবেনা কারণ আমার আরেক ভাগ্নে সাদীর (আমার খালাতো বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা হাবিবা খাতুনের ছেলে) সাথে উনার যোগাযোগ হয়েছে এবং ও গাড়ী নিয়ে আসবে। কিন্তু শেষ মূহূর্তে সাদী আসতে পারবেনা বলে জানিয়েছে। হাসান জানালেন যে বিকল্প হিসেবে তিনি তার ছোট ছেলে সাকিবকে আসতে বলেছেন এবং ও এখন এয়ারপোর্টের পথে। কিন্তু আমাদের দ'জনকেই অবাক করে দিয়ে কেমন করে যেন মাহমুদ হাসানের সুপরিসর বুইকের বুট এবং পেছনের সীটের অর্ধেকের মধ্যেই আমাদের যাবতীয় মাল এটে গেলো। সাকিবকে মাঝপথ থেকে ফিরে যেতে বলে আমরা হাসানের বাসার পথে রওয়ান হলাম।

নিউ ব্রানসউইক ন্যুয়ার্ক এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দুরে একটি ছোট বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক শহর। রাটগার্স ইউনিভার্সিটিকে কেন্দ্র করেই এ শহরের পত্তন ও বিস্তার। হাসানরা যে সাবার্বে থাকেন তার নাম ইষ্ট ব্রানসউইক । পয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা বাসায় পৌঁছে গেলাম। এই আবাসিক এলাকাটি খুবই সুন্দর, ছিমছাম এবং বোঝা যায় যে এখানে বেশ বিত্তশালী লোকদের বাস। প্রায় প্রতিটি বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান এবং ড্রাইভওয়ে এবং গ্যারেজ মিলে তিন থেকে চারটি গাড়ী। এলাকার প্রতিটি বাসাই বেশ বড় এবং একটা থেকে আরেকটা বেশ দূরে অবস্থিত। এ বাসায় মাহমুদ হাসান ও তার স্ত্রী আমাদের মঞ্জু ভাবী

তাদের বড় ছেলে শিবলি, একমাত্র মেয়ে সাবরিনা এবং তাদের পোষা বেড়াল 'কিউনি'কে নিয়ে থাকেন। তাদের দ্বিতীয় ছেলে সাকিব তার স্ত্রী নাইমাকে নিয়ে ওর কাজের জায়গার কাছে একটা আলাদা এপার্টমেন্টে থাকে।

গাড়ী গ্যারেজে ঢুকতেই মাহমুদ হাসানের বড় ছেলে শিবলী মালপত্র নামাতে সাহায্য করার জন্য চলে এলো। বাসায় ঢুকতেই মঞ্জুভাবী 'আস সালামু আলাইকুম' বলে বেশ জোরেসোরে আমাদের সাদর সম্ভাষন জানালেন। চকিতে পয়ত্রিশ বছর আগের একই ধরণের আরেকটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তারিখটা মনে নেই তবে সম্ভবতঃ ১৯৭০ সালের জুলাই মাসের কোন একটা দিন হবে। স্থানটি ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির ব্লুমিংটন ক্যাম্পাসের হুজিয়ার কোর্টসে আমাদের বি বাই সেভেন নাম্বারের এফিসিয়েন্সি এপার্টমেন্ট। স্বামীর সাথে যোগ দেবার জন্য সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত মিসেস মাহমুদ হাসান - আমাদের আজকের স্বামী-সন্তান-পুত্রবধু নিয়ে গড়া পরিবারের পরিণত গিন্নী মঞ্জুভাবী সেদিন ঢাকা থেকে তাদের কোলের ছেলে শিবলিকে নিয়ে মাত্র এসে পৌঁছেছেন। আমাদের বাসায় সে রাতে তার এবং আমাদের আরো অন্যান্য বন্ধুদের খাবার নিমন্ত্রন। চোখে মুখে জেটল্যাগ এবং কোলের শিশু নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম জনিত একরাশ ক্লান্তির ছাপ নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকতেই আমরা পুরোনোরা তাকে স্বাগত জানালাম। হাসানের মতোই মঞ্জুভাবীও খুব একটা বদলান নি; বয়সতো অবশ্যই তার ছাপ রেখে গেছে, কিন্তু তার অত্যন্ত ধীর লয়ে, মৃদুস্বরে কথা বলা এবং তার স্বামীর মতোই সব সময়ে হাসিখুশী থাকার অভ্যাস একটুও পালটায় নি।

'পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায় .....' পুরোনো দিনের কথা ভেবে আমি সম্ভবতঃ একটু অন্যমনষ্ক হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবীর কথায় আবার বাস্তবে ফিরে এলাম। তিনি হাত মুখ ধুয়ে লাদ্র খাবার জন্য তাড়া দিচ্ছেন। লাদ্রের কথা শুনে হঠাৎ করেই যেন ক্ষিধেটা চাড়া দিয়ে উঠলো। সকাল চারটায় সামান্য চা-বিস্কুট খাবার পর আর তেমন কিছু খাওয়া হয়নি। শিকাগো এয়ারপোর্টে এক গ্লাস টাটকা ফলের রস কিনেছিলাম, কিন্তু সেটা মোটেই সুবিধের ছিলনা। আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ হতে পারে, কিন্তু এদের এয়ারলাইনসগুলোর ইনফ্লাইট সার্ভিস পৃথিবীর মধ্যে জঘন্যতম। স্বল্প দূরত্বের ফ্লাইটের কথা বাদই দিলাম, দুর পাল্লার ফ্লাইটেও কোন খাবার দেওয়া হয়না, কিনে খেতে হয়। আর যে সব খাবার এসব ফ্লাইটে পাওয়া যায়, সেগুলো এদের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের মতই জঘন্য মানের। একজন মুসলমান হিসেবে সেগুলো খাওয়া ধর্মসম্মত কিনা সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর তাই আমেরিকার আভ্যন্তরীন ফ্লাইটে আমি বা নাসিম সচরাচর কিছু খাইনা। অতএব ভাবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাত মুখ ধুতে গেলাম। মাহমুদ হাসান জানালেন যে আমার ভাগ্নে সাদী, ওর স্ত্রী বাংলাদেশের বামপন্থী নেতা রাশেদ খান মেননের মেয়ে সুবর্ণা ওদের একমাত্র ছেলেকে নিয়ে কিছুক্ষনের মধ্যেই এসে যাবে বলে জানিয়েছে। আমার কাছ থেকে টেলিফোন নাম্বার নিয়ে উনি আমার ভাগ্নী মাহারীন ও তার স্বামী তারেককেও আসতে বললেন। আজকে দুপুরের খাবারে সাকিব ও নাইমার ও এখানে আসার কথা ছিল, কিন্তু ওদের নুতন এপার্টমেন্টে রং করা নিয়ে কি যেন ঝামেলা হচ্ছে বলে ওরা আসতে পারবে না বলে জানিয়েছে।

মাহমুদ হাসান বেশ খানেওয়ালা লোক। কিন্তু আমাদের যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন আমি তার চেয়েও অনেক বেশী ভোজন রসিক ছিলাম। (এখনো যে ভোজন রসিক নই তা নয়, তবে একমাত্র ছোটভাই হার্ট এটাকে মারা যাবার পর থেকে গিন্নী একটু নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন।) সম্ভবতঃ সেই সময়ের কথা মনে রেখেই মঞ্জু ভাবী মাছ, মাংস, শাক, সবজী ডাল সহ পদ্র ব্যঞ্জন, জিলিপি ও রসগোল্লা সহ তিন চার ধরণের মিষ্টি, দু রকমের ফল আর সব শেষে পানের ব্যবস্থা রেখেছেন। গল্প গুজবের মধ্য দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হলো।

চলবে - -

*(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)*